কারুবাসনার "দ্যূতক্রীড়ক"

সমীর চট্টোপাধ্যায়

(ক) বাংলা নাট্যজগতের 'বড়বাবু' শিশিরকুমার ভাদুড়িকে নিয়ে উপন্যাস লিখলেন কেন ব্রাত্য?

চরিত্রনির্ভর লেখা, সেই চরিত্র ঘিরে আবর্তিত সময়, সময়ের বিবর্তন, মূল চরিত্রকে ঘিরে রাখা অনেকানেক চরিত্র, 'সময়' ধরে লেখা ব্রাত্যর প্রিয় বিষয়। এই সময়ের অগ্রগণ্য নাটককার ব্রাত্য এই খেলা খেলেছেন তাঁর লেখা অনেক নাটকে। সেইসব নাটক পাঠকধন্য হয়েছে, মঞ্চে অভিনয়ে বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে। 'রুদ্ধসঙ্গীত', 'বোমা', 'মীরজাফর' যেমন। সাহিত্যের সেরা সম্মান 'সাহিত্য আকাদেমি' পুরস্কারেও সম্মানিত হয়েছে 'মীরজাফর' নাটকটি। কয়েক বছর আগে ব্রাত্য লিখলেন ফিওদর দস্তয়েভস্কির জীবন ও সময় নিয়ে নাটক 'ফিওদর'। আমার মতে সাম্প্রতিক সময়ে ব্রাত্যর লেখা শ্রেষ্ঠ নাটক। সবই বিশেষ বিশেষ সময়ের প্রেক্ষিতে বিশেষ বিশেষ চরিত্রনির্ভর লেখা যাকে কেন্দ্র করে প্রাসঙ্গিক কিছু চরিত্রও আবর্তিত।

ব্রাত্য এই সময়ের একজন মননশীল গদ্যকার। উল্লেখনীয় প্রাবন্ধিক। কবি, কবিতা, নাটক, নাট্যকার, কবিতা ও নাটকের অনুবাদ, সিনেমা, সিনেমাকার, বইয়ের আলোচনা এমনকি ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ ইত্যাদি বহুমুখী বিষয় নিয়ে ব্রাত্য তাঁর ঈর্ষণীয় অননুকরণীয় গদ্যে নিয়মিত বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লিখে থাকেন। সেইসব লেখায় ব্যক্তি, ব্যক্তিত্ব, তাঁদের সৃজন এবং পরিপার্শ্ব সময় এমনকি রাজনৈতিক সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে গভীর আলোচনা করেন। পিরানদেল্লো, ব্রেখট, বার্গম্যান থেকে আফ্রিকান নাটককার উলে সোইংকা, মায়াকভস্কি, সিলভিয়া প্লাথ এমন বহু বহু উজ্জ্বল নক্ষত্র ওঁর আলোচনা জুড়ে থাকে।

তাহলে বাংলা নাট্যজগতের 'বড়বাবু' যাঁকে প্রথম 'আধুনিক' নট ও নির্দেশক বলে মান্য করা হয়, সেই শিশিরকুমার ভাদুড়িকে কেন্দ্রীয় চরিত্র করে নাটক নির্মাণ করলেন না কেন ব্রাত্য! কেন লিখলেন না তথ্যসমৃদ্ধ দীর্ঘ প্রবন্ধ! ব্রাত্য যখন মূলত নাটককার এবং গদ্যকার তখন সেটাই তো ছিল স্বাভাবিক।

কিন্তু ব্রাত্য লিখলেন উপন্যাস।

এরকমই একটি 'অভাবিত' কাজ ব্রাত্য করলেন এর আগেই। বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের দুই চিরস্মরণীয় নাটকীয় ব্যক্তিত্ব অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি এবং অমৃতলাল বসু, তাঁদের জীবন সময় লড়াই স্বপ্ন স্বপ্নভঙ্গ নিয়ে লিখলেন একটি উপন্যাস 'অদামৃতকথা'। ব্রাত্যর প্রথম উপন্যাস। এঁদের উপজীব্য করে এঁদের সময় প্রেক্ষাপটে রেখে নাটক লিখতে পারতেন, নব দিগন্ত উন্মোচনকারী প্রবন্ধ লিখতে পারতেন। না, ব্রাত্য লিখলেন উপন্যাস। পাঠক সচকিত হল। সমাদৃত হল এই উপন্যাস। পাঠকের সমাদর কি ব্রাত্যকে

শিশিরকুমার জীবন-আশ্রিত এই দ্বিতীয় উপন্যাস লেখায় উদ্বুদ্ধ করল?

না। ভাবনা ব্রাত্যর স্থির মস্তিষ্কের, সুপরিকল্পনার।

বিস্তৃত এবং ব্যাপক পঠন অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ দূরদর্শী ব্রাত্য জানেন, জীবন এবং তাকে ঘিরে যে সময়ের ব্যাপ্তি, তার ধারাবাহিকতার বর্ণনা কাহিনিবৃত্তের সুগঠিত অখণ্ড আকারে উপন্যাসে যতটা সম্ভব, নাটকে তা সীমাবদ্ধ। চরিত্রের যথোচিত মর্যাদা বা গুরুত্ব দানের জন্য যে ঐক্য বা পরিসর প্রয়োজন তা নাটকের নির্দিষ্ট সময়সীমায় রক্ষা করা বা পরিস্ফুট করা অসম্ভব। মূল চরিত্রের সঙ্গে ইতিহাস প্রসূত অনেক চরিত্র অনেক ইতিবৃত্ত যুক্ত হয়, মূল ধারার পাশাপাশি শাখা প্রশাখার মতো কাহিনি যুক্ত হয়, কখনও স্বাভাবিক কখনও বা অস্বাভাবিক বিস্তারও পায়। এই বিস্তার পাঠকের যাতে বাহুল্য মনে না হয়, সে সম্পর্কে লেখক সতর্ক থাকলেও কখনও কখনও লেখক তা পরিকল্পিত রূপে অতিক্রমও করেন। ঔপন্যাসিকের যেখানে নির্মাণের স্বাধীনতা, নাটককারের সেখানেই সীমাবদ্ধতা। আবার সংলাপ সর্বস্বতা এবং নাট্যমুহূর্ত নির্মাণ যখন নাটকের ঐশ্বর্য, উপন্যাসে সেখানেই দুর্বলতা। ব্রাত্য তাই ওই দুই ক্ষেত্রেই উপন্যাসের পথেই হেঁটেছেন, স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে চেয়েছেন, বড় পরিসর ব্যবহার করেছেন, নাট্যরচনা থেকে বিরত থেকেছেন।

দেশ বিদেশের সাহিত্যের দীর্ঘ সময়ব্যাপী পাঠ-অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ ব্রাত্য নিশ্চিতরূপে জানেন, জীবনভিত্তিক কাহিনি যা 'বায়োপিক' এই নামেই চটজলদি পরিচিত, তা খুবই জনপ্রিয় বিশ্বের সব ভাষায়, বঙ্গভাষাতেও। অধিকাংশ লেখাই কাহিনির কল্পনাপ্রসূত বিস্তারে এবং মনগড়া সংলাপে জনপ্রিয়। এই লিখনশৈলী একটি মোহিনী ফাঁদ। লেখক এই ফাঁদে প্রলুব্ধ হন। লেখা পাঠকমহলে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে, প্রকাশক এবং লেখক উভয়েরই অর্থাগম হয়। এই জনপ্রিয়তা কোনও কোনও লেখার ক্ষেত্রে দীর্ঘ স্থায়িত্ব পায়, কখনও চকিতে ঝড় তুলে বিলীন হয়ে যায়।

ব্রাত্য এও জানেন, সমগ্র বিশ্বের সাহিত্য জুড়ে উপন্যাসের গঠন, ভাবনা, নির্মাণ, দর্শন — সব কিছুরই বদল হয়েছে। অনেক কাল হল। উপন্যাস এখন আর নিছক গল্প বোনা নয়। ঘটনার ঘনঘটা নয়। দীর্ঘ উচ্ছ্বাসপূর্ণ ফেনিল বর্ণনা বা আকস্মিক চমক নয়। সুনির্দিষ্ট চিন্তা, পরিকল্পিত ভাবনার ফসল। তথ্যেরও সমাহার। অথচ তা অধিক হলে, অনাবশ্যক হলে, লেখকের অর্জিত জ্ঞানভাণ্ডারের অযাচিত প্রদর্শন হলে পাঠক ভারাক্রান্ত হতে পারেন। পাঠক ক্লান্ত বোধ করতে পারেন। মনোযোগ বিঘ্নিত হতে পারে। উপন্যাসের চলন শ্লথ হতে পারে। লেখককে তাই সজাগ থাকতে হয়, সতর্ক হতে হয়। লেখার আবেদন মগজনির্ভর। অধুনা উপন্যাসে লেখক যেন পাঠকের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। তাঁর দর্শন, ইতিহাস সচেতনতা, মানবিক মূল্যবোধ দিয়ে পাঠককে সঞ্জাত করার প্রয়াস নেন। ভাবালুতা নয়, পাঠক তাঁর বোধ এবং তাঁর নিজস্ব জীবনদর্শন, পাঠাভ্যাস দিয়ে উপন্যাসের মর্মমূলে পৌঁছনোর প্রয়াস নেবেন, অভিজ্ঞ হবেন। পাঠককে তরল কাহিনিতে আপ্লুত করা অধুনা ঔপন্যাসিকের অভীপ্সা নয়। পাঠসমৃদ্ধ ব্রাত্যর এসব অজানা নয়। তাই 'দ্যূতক্রীড়ক' শিশিরকুমারের এককেন্দ্রিক জীবনকাহিনি না হয়ে হতে চেয়েছে সেই সময়েরও প্রামাণ্য দলিল।

খুবই নাটকীয় জীবন শিশিরকুমারের। কৃষ্টিশীল সম্ভ্রান্ত পরিবারের মানুষ। ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক, উচ্চশিক্ষিত,আধুনিক মানসিকতার। যে সময়ে তিনি নাটককে প্রধান অবলম্বন করছেন, সেই সময়ে বাংলা নাটকের যে পরিবেশ, যে সামান্যতম আরোহণ, অমন উচ্চশিক্ষিত কেউই অধ্যাপনার পেশা পরিত্যাগ করে নাটকে পূর্ণ সময় নিয়োজিত করার দুর্ভাবনাটুকুও করতেন না। তাঁর বন্ধুবৃত্তে বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি, চিন্তন দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মনীষীবৃন্দ। তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃবর্গের প্রধানতম প্রায় সকল ব্যক্তিত্ব তাঁর সুহৃদ, শুভানুধ্যায়ী, গুণমুগ্ধ । রবীন্দ্রসাহিত্যের তিনি অনুরাগী পাঠক। রবীন্দ্রভক্ত শিশিরকুমার তাঁর নাটকে

রবীন্দ্রসঙ্গীত ব্যবহার করেছেন। প্রথম। রবীন্দ্রনাথের নাটক পেশাদারি রঙ্গালয়ে মঞ্চস্থ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ শিশিরকুমারের আমন্ত্রণে প্রথম পাবলিক থিয়েটারে গেলেন নাটক দেখতে। নাটক তেমন পছন্দ হল না কিন্তু শিশিরকুমারের অভিনয়ে মুগ্ধ হলেন। তাঁর লেখা নাটক পাবলিক থিয়েটারে স্টেজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। শিশিরকুমারের অভিনয়রীতি, সংলাপ উচ্চারণ, মঞ্চভাবনা, স্বরপ্রক্ষেপণ, আলোর ব্যবহার, নাট্যভাবনা, নাটক পরিচালনা বাংলা সাধারণ রঙ্গালয়ের আমূল বদল ঘটাল। নিজস্ব মঞ্চ — জাতীয় নাট্যশালার ভাবনা ভাবলেন, প্রয়াস নিলেন। নাটকের দল নিয়ে পরাধীন ভারতে প্রথম বাঙালি নাট্যপরিচালক বিদেশে আমন্ত্রিত হয়ে নাটক করলেন। নিজের নিশ্চিন্ত গার্হস্থ্যজীবন, অর্থনৈতিক নিরাপদ জীবন বিঘ্নিত করে থিয়েটার, শুধুমাত্র থিয়েটারের জন্য নিজেকে বিড়ম্বিত করলেন বারবার। নিজের জীবন নিয়ে নিরাপত্তা নিয়ে জুয়াড়ির মতো জুয়া খেলেছেন। ব্রাত্য এহেন নিয়তিনির্দিষ্ট শিশিরকুমারের কথা লিখতে গিয়ে তাঁকে 'দ্যূতক্রীড়ক' বললেন। লিখলেন উপন্যাস।

খ) কোথায় ঔপন্যাসিক ব্রাত্যর অভিনবত্ব, কীসের জন্য এই উপন্যাস অসাধারণত্ব দাবি করতে পারে, কোথায় কোথায় আলো ফেলেছেন ব্রাত্য যাতে শিশিরকুমারের অনালোকিত অংশ পাঠকের গোচরে এসেছে?

প্রায় এক লক্ষের অধিক শব্দের উপন্যাস 'দ্যূতক্রীড়ক'। বৃহৎ উপন্যাস। উপন্যাসের শুরু শিশিরকুমার যখন সাতাশ। উপন্যাসের শেষ শিশিরকুমার তখন বিয়াল্লিশ। শিশিরকুমারের জীবনের পনেরো বছর জুড়ে এই উপন্যাস। সত্তর বছরের জীবন শিশিরকুমারের। এরও পরে আরও আঠাশ বছরের জীবন শিশিরকুমারের। যে জীবন আরও ক্ষোভ আরও হতাশা আরও স্বপ্নভঙ্গের। সেই কাহিনি নিশ্চয়ই লিখবেন ব্রাত্য। ভবিষ্যতে। আমরা পাঠক, আশা তো করবই।

উপন্যাসের কাহিনি বলা, ঘটনার পরম্পরা উল্লেখ করা আমার অভীপ্সা নয়। পাঠক তাঁর নিবিষ্ট পাঠে তাতে অবগাহন করবেন, উপন্যাসের অন্দরে এবং অন্তরে প্রবেশ করবেন। পাঠক সেখানে নিজেই আবিষ্কারক। আমার উদ্দেশ্য এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের ভাবনা এবং লেখনীর জাদুতে যেখানে যেখানে চমৎকারিত্ব তা স্পর্শ করার প্রয়াস।

অনেক চরিত্র অনেক ঘটনা এই উপন্যাসে। কোনও কোনও চরিত্র, কোনও কোনও ঘটনার বর্ণনায় লেখক পরিকল্পিত ভাবে তার উৎসস্থলে পৌঁছে গেছেন। কোনও কোনও চরিত্র বা ঘটনায় যেন ছোটগল্পের বীজ লুকিয়ে আছে। শিশিরকুমারের চরিত্রের গভীরতা নিঃসঙ্গতা অনমনীয়তা, প্রেম ও বিষাদ, স্বীকৃতি ও উপেক্ষা বোঝানোর জন্যই এইসব পার্শ্বচরিত্র, গল্পাভাস, আবহসৃষ্টির প্রয়োজন ছিল।

উপন্যাসের শুরু অভিনব, যা বাংলা সাহিত্যে সাধারণত পরিলক্ষিত হয় না। প্রথম অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের অর্ধ পরিসর পর্যন্ত লেখক যেন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ঘরানার আলাপ পর্বের মতো উপন্যাসের আবহ তৈরি করলেন। যে আবহে শিশিরকুমারের হয়ে ওঠার প্রাথমিক পর্ব, সেই পর্বে তাঁর নিজের পরিবার, বাবা মা, বাবার পরিবার, মায়ের পরিবার, দাদামশাই, বন্ধুদের ভূমিকা, নিজের সাহিত্যপ্রীতি, আবৃত্তি, নাটকের প্রতি অনুরাগ দক্ষ শিল্পীর রেখাঙ্কনের মতো পাঠকের সামনে তুলে ধরলেন ব্রাত্য। পাঠকের বুঝে নিতে অসুবিধা হল না শিশিরকুমারের চরিত্র গঠনে দাদামশায়ের পাণ্ডিত্য, মায়ের কোমল অথচ দৃঢ় মানসিকতা, বাবার নিস্পৃহ একরোখা মনোভাব, উজ্জ্বল বুদ্ধিমান বন্ধুদের প্রশ্নহীন সাহচর্য কী গভীর ভূমিকা নিয়েছিল। উপন্যাস প্রকৃত অর্থে মূল কাহিনিতে প্রবেশ করছে দ্বিতীয় অধ্যায়ের অর্ধাংশের পর যখন বন্ধু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় খবর পেয়ে ডাক্তার এবং উকিল নিয়ে পৌঁছচ্ছেন শিশিরকুমারের

বাড়িতে। শিশিরের স্ত্রী ঊষা আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করেছেন । ঊষা তখন বাইশ। শিশিরকুমারের সাতাশ। একমাত্র পুত্র অশোককুমার তখন চার। স্ত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে শিশিরকুমারও অগ্নিদগ্ধ। অনুতপ্ত শিশির বন্ধু সুনীতিকুমারকে বলছেন, ''মেয়েদের সম্বন্ধে কখনও উদাসীন হোস নে সুনীতি।" লেখক ব্রাত্য এর পর পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মতো কাহিনির পর কাহিনির পরত বার করে ঐতিহাসিক সময়ের আড়াল তুলে ফেলতে থাকেন। ঊষার পারিবারিক ইতিহাস, তাঁদের বিবাহ, বিবাহিত জীবনে ঊষার একাকিত্ব বোধ, শিশিরের বন্ধুবলয়, কাব্যপ্রেম, থিয়েটারের প্রতি অন্ধ আকর্ষণ। ইতিহাসখ্যাত অসংখ্য চরিত্র — বঙ্গ মনীষার জগতে যাঁদের গভীর প্রভাব আজও, কত ইতিহাসবিশ্রুত ঘটনার বিচ্ছুরণ — প্রত্যেকটি নিপুণ শল্যচিকিৎসকের মতো ব্রাত্য গভীর থেকে গভীরে গিয়ে বিবৃত করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন। সেই অভিশপ্ত দিনে অনেক রাতে সুনীতির হাত ধরে আক্ষেপে দীর্ণ অনুতপ্ত শিশিরকুমারের হাহাকারে যে সংলাপ আরোপ করলেন ঔপন্যাসিক তা যেন নিয়তিনির্দিষ্ট, অমোঘ — ''আমার জীবনের যাবতীয় ভুল কাজ করবার পরে তা এক বিষম অভিশাপ হয়ে বারবার আমার কাছে ফেরত এসেছে। আমি বারবার এক কানা গলির মুখে এসে দাঁড়িয়েছি। সেখান থেকে কী করে ফেরত যেতে হবে, তা আমি ভাল করে বুঝতেও পারিনি। বদ্ধ এক উন্মাদের মতো লেগেছে নিজেকে তখন। শুধু এক কারুবাসনার অদম্য তাগিদ আমাকে বারবার আবার স্বাভাবিক হৃদয়ে, স্বাভাবিক মস্তিষ্কে ফেরত এনেছে। তুই বিশ্বাস কর সুনীতি,আমি আর থিয়েটার করতে চাই না, অভিনয় করতে চাই না, কারুনির্মাণ করতে চাই না, কিন্তু আমার কোনও উপায় নেই। আমি ছাড়তে চাইলেও কারুবাসনা আমাকে ছাড়ে না । সে বারবার তার অলৌকিক সঙ্কেত পাঠায় আমাকে। আমিও এক বুনো ক্ষ্যাপার মতো মেতে উঠি। যে জীবনে এসে আজ আমি দাঁড়ালাম, জানি না আমার ভবিষ্যতে কী আছে। আমি আন্দাজ করতে চাইলেও, তার তল খুঁজে পাব না জানি। শুধু এটুকু জানি, আমি অভিশপ্ত। এই বাসনা আমার সর্বাঙ্গে তার অভিশাপ লেপে দিয়েছে। এর থেকে এ জীবনে আর আমি বেরোতে পারব না।"

সমগ্র জীবন এই কারুবাসনা থেকে বেরতে পারেননি শিশিরকুমার। কোনও প্রকৃত শিল্পী কি পারেন ?

শিশিরকুমারকে চিত্রিত করার পাশাপাশি বিশেষত এই শহর কলকাতার তখনকার রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক বিভিন্ন প্রসঙ্গের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এবং বিশ্লেষণ ব্রাত্য করেছেন। এই উপন্যাসের এটি একটি প্রবল বৈশিষ্ট্য। নাট্যমঞ্চের দখল, বিভিন্ন নাট্যদলের সংঘাত, অভিনেতা অভিনেত্রী নিয়ে নাট্যদলের টানাপোড়েন, নিষিদ্ধপল্লীর মহিলাদের অভিনেত্রী হয়ে ওঠা এবং বিশিষ্ট হয়ে ওঠা নিয়ে আকচা আকচি, পারস্পরিক ঈর্ষা অসূয়া, শিশিরকুমারকে কোণঠাসা করার ষড়যন্ত্র — গভীরে প্রবেশ করে বিস্তারিত করেছেন ব্রাত্য।

১৮২৫ সাল থেকে কলকাতায় যে অবাঙালি ব্যবসায়ীরা পরিযায়ী হয়ে আসতে শুরু করে বিভিন্ন ব্যবসায় ছড়িয়ে পড়ে বাজার কুক্ষিগত করতে থাকে এবং যারই প্রবাহে অবিভক্ত বঙ্গে কী নাটকে কী সিনেমায় বৃহৎ পুঁজি ম্যাডান হাউসের প্রবেশ তা বিস্তারিত লিখলেন ব্রাত্য। এই উপন্যাসে শিল্পে প্রথম বৃহৎ পুঁজি ম্যাডান হাউসের ভূমিকা অনেক জায়গা জুড়ে আছে যা নাট্য গবেষকদেরও উৎসাহী করবে।

ইতিহাস বিবৃত করতে গিয়ে তখনকার বাজারদর থেকে শুরু করে স্প্যানিশ ফ্লু, মারোয়ারি রায়ট, শহরের সমাজবিরোধী অঞ্চল এবং তার প্রভাব — কোনও কিছুই এড়িয়ে যাননি লেখক।

তখনকার বাজার দর, শিশির তখন ৩১, একটু উদ্ধৃতির আগ্রহ সংবরণ করা কঠিন। — ''তিন বছর আগে তৈরি হওয়া নতুন কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে এদিন কিছু কেনাকাটা করেছেন তিনি (শিশির)। কাটা রুইমাছ এখানে এখন ছয় আনা সের যাচ্ছে। আজ দু সেরি একটা কাতলা কিনলেন শিশিরকুমার। তার সঙ্গে ছ পয়সা সেরি মুগডাল আর চার পয়সায় এক সের ময়দা। সঙ্গে দু পয়সার আটটা রসমুণ্ডি

কিনলেন বাজারের বাইরে মিষ্টির দোকান থেকে। মিষ্টির দোকানদার সঙ্গে দুটো রসমুণ্ডি ফাউ দিল। বাজার করে মন ভাল হয়ে গেল শিশিরকুমারের।" যে কোনও সময়ের বাজারদর সেই সময়ের অর্থনীতির সূচক। এটা জানাতে ভোলেননি ব্রাত্য।

জিনিসপত্রের বিজ্ঞাপন কীরকম হত তার নমুনাও জানাতে ভোলেননি লেখক। মা কমলেকামিনীকে নিয়ে শিশির গেছেন নাটক দেখতে। নাটক শুরুর আগে প্রসেনিয়ামে ক্যানভাসের পর্দার ওপর বিজ্ঞাপন ভেসে উঠল।

১। জারমনীন, জ্বরের যম — ডি গুপ্তর ম্যালেরিয়ার মহৌষধ।
২। হিলির বাম : সতীশ কবিরাজের শ্বাসারি।
৩। শান্তিরস সালসা : বৃহৎ অট্টালিকা চূর্ণ। কৈলাস দাশ লেন।
৪। কাশির বটিকা : কে সি শর্মা এন্ড কোং, মসজিদবাড়ি স্ট্রিট।
৫। বরের পোশাক ভাড়া পাওয়া যায়:ললিতমোহন দত্ত, আপার চিৎপুর রোড।

মুহূর্তের মধ্যে লেখক পাঠকের সামনে সেই সময়ের আর্থ-স্বাস্থ্য-সামাজিক চিত্র নিখুঁত তুলে ধরলেন। একটা পিরিয়ড নভেলের কী প্রয়োজন এবং লক্ষণ ব্রাত্য জানেন।

সেই সন্ধ্যায় শিশির জীবনে প্রথম একই সঙ্গে দুই প্রবাদপ্রতিম নট অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি এবং গিরিশচন্দ্র ঘোষকে দেখলেন। প্রথম জনকে শুধুই দেখলেন, অনিবার্য কারণবশত অর্ধেন্দুশেখর অভিনয় করতে না পারায় তাঁর পরিবর্তে অভিনয় করলেন গিরিশচন্দ্র। গিরিশচন্দ্রের অভিনয় দেখলেন দু'চোখ ভরে।

পাশাপাশি স্বাধীনতা আন্দোলন, রাজনৈতিক নেতৃবর্গ, রাজনৈতিক অস্থিরতা — সেসবও বিস্তারে বলেছেন ব্রাত্য। শিশিরকুমারের অন্তর্লীন বিষাদ, নতুনত্বের আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্নপূরণের উচ্ছ্বাস আবার স্বপ্নভঙ্গের একাকিত্ব — সর্বোপরি শিশিরকুমারের অবস্থান পাঠকের সামনে সুনির্দিষ্ট করার জন্য।

শিশিরকুমারের সৌভাগ্য তাঁর গুণমুগ্ধ বন্ধু এবং সুহৃদবলয় যাঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, তাঁরাই ছিলেন শিশিরের প্রকৃত সমঝদার। শিল্প সাহিত্য বিদ্বজ্জন-সমাজ এমনকি রাজনৈতিক নেতৃবর্গের এক বিরাট অংশ শিশিরকুমারের প্রতিভায় মুগ্ধ ছিলেন, তাঁর নাট্যচর্চার প্রসারে উৎসাহী ছিলেন। শিশির যেমন ছিলেন আদ্যন্ত রবীন্দ্রভক্ত, রবীন্দ্রনাথের নাটক মঞ্চস্থ করা, রবীন্দ্রসঙ্গীত পাবলিক থিয়েটারে প্রয়োগ করার পাইওনিয়ার — রবীন্দ্রনাথ তেমনই শিশিরের আমন্ত্রণেই সমস্ত ব্রীড়া অতিক্রম করে শিশিরকুমারের অভিনয় দেখতে পাবলিক থিয়েটারে এলেন, সঙ্গী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শিশিরের অভিনয়রীতি পছন্দ করলেন, নিজের নাটক সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হওয়ার ব্যাপারে উৎসাহী শিশিরে ভরসা করলেন।

প্রকৃতপক্ষে যে কোনও কারও 'হয়ে ওঠা' বুঝতে হলে তাঁর পরিপার্শ্বকে জানা যে কী ভীষণ জরুরি ব্রাত্য জানেন, তাই নিপুণ শিল্পীর নকশিকাঁথা বুননের মতো পাঠকের সামনে ধৈর্য সহকারে শিশিরকুমারের প্রতিটি পর্ব উপস্থিত করেছেন। কোনও পাণ্ডিত্যের স্পর্ধা নেই, কাহিনিকারের নৈর্ব্যক্তিক মনোভাবই সম্বল ব্রাত্যর।

এই উপন্যাসে ব্রাত্য শুধুমাত্র অনুসন্ধানী কথক হতে চাননি। যে কোনও বড় ঔপন্যাসিক দরদী, মানবিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী। শিশিরযুগের যাঁরা নটী তাঁরা পতিতা, সমাজবর্জিতা। সুশীলাবালা, কুসুমকুমারী, নীরদাসুন্দরী, প্রভাদেবী, ইন্দুবালা, নিভাননী, চারুশীলা, কঙ্কাবতী — যেসব নটী তখন সাধারণ রঙ্গালয়ের

প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী, প্রত্যেকের কাহিনিকথনে কী পুঙ্খানুপুঙ্খ কী মানবিক কী দরদী ব্রাত্য। শিশিরকুমার-নিভাননী পর্ব, শিশিরকুমার-কঙ্কাবতী সম্পর্ক লেখক ব্রাত্যর লেখনীর জাদুতে মর্মস্পর্শী।

শিশিরকুমারের নাট্যদল নিয়ে আমেরিকা ভ্রমণ এবং তার জটিল করুণ অভিজ্ঞতা এই উপন্যাসের একটি বৃহৎ অংশ। এই পর্ব প্রত্যেক উৎসাহী পাঠক বিশেষত নাট্যামোদী পাঠকের জন্য জরুরি এবং আগ্রহের।

শিশিরকুমার আমেরিকা যাচ্ছেন তখন তিনি একচল্লিশ। বিপুল আশা, অকল্পনীয় জেদ, স্বচ্ছ পরিকল্পনা, একরাশ স্বপ্ন তাঁর পাথেয়। কী অসহনীয় পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হল তাঁকে অবশেষে আমেরিকায় তা কল্পনাতীত। সতু সেন দেবদূতের মতো সাহায্য না করলে, সম্পূর্ণ ব্যবস্থা না করলে শিশিরকুমারের জীবনবৃত্ত কোন খাতে প্রবাহিত হত কে জানে। ঠিক সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথের আমেরিকা ভ্রমণ। বিশ্বভারতীর অর্থ সংগ্রহের জন্য কবির অনুষ্ঠান আয়োজন। কবির সঙ্গে দেখা হল শিশিরের। কবির অনুষ্ঠানের লজ্জাজনক আয়োজন। মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা। শিশিরকুমারের ভগ্নমনোরথ মানসিক অবস্থায় দেশে ফেরা। উপন্যাসের একটি মূল্যবান পর্ব — আশা ও আশাভঙ্গের পর্ব — ব্রাত্যর লেখনীতে সজীব। কখনও কোনও শৈথিল্য, অমনোযোগ নেই ব্রাত্যর।

স্ত্রীর আত্মহত্যার ঘটনা দিয়ে উপন্যাস শুরু। শিশির তখন সাতাশ। উপন্যাসের শেষ — আমেরিকা সফর প্রায় অসমাপ্ত করে ভগ্ন মনে বিধ্বস্ত শরীরে দেশে ফিরছেন শিশির । জাহাজে। শিশির তখন বিয়াল্লিশ। করাচিতে অবতরণ করে দিল্লিতে সরকারি ব্যবস্থাপনায় 'সীতা'-র কল শো করে কলকাতায় ফিরবেন।

উপন্যাসের অন্তিম পর্বে ব্রাত্য এক জাদুবাস্তব পরিবেশ তৈরি করলেন। জাহাজের ডেক প্রায়ান্ধকার, শিশির বসে আছেন একা। শিশিরকুমার দেখলেন, ডেকের এক কোণে পাশ ফিরে তাঁর মৃত পিতা হরিদাস ভাদুড়ি দাঁড়িয়ে। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে দূরের ঝলমলে আরব উপকূল দেখছেন যেন। সেই বাবা হরিদাস যিনি জীবনের শেষ কটি বছর উদাসীন নৈর্ব্যক্তিক জীবন যাপন করেছিলেন। পিতা পুত্রের অলীক সংলাপ রেখেছেন ব্রাত্য এখানে। পিতা হরিদাস পুত্র শিশিরকুমারকে ব্যর্থ ঘোষণা করলেন, স্বাভাবিক জীবনে ফেরার কথা বললেন। শিশিরকুমার তা প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি তাঁর স্বপ্নে স্থির। আশাবাদী। দৃঢ়চিত্তে শোনালেন তা। ''হ্যাঁ, আমি এইরকম জুয়াড়ি হয়েই বাঁচবো। আর ক্রমাগত তিন তাস ফেলে যাবো জীবনের মাটিতে। একদিন হয়তো ইস্কাবনের টেক্কা পাবো, আর একদিন হয়তো পাবো চিড়িতনের দুরি। কিন্তু আমি ধাওয়া করে যাবো। ঘোড়ায় যখন উঠেই পড়েছি তখন শেষদিন পর্যন্ত ঘোড়াটাকে ছুটিয়ে যাবো। বদনাম, সুনাম, দুর্নাম সব একাকার করে আমি আমার বদ্ধ, দমবন্ধ করা মরা শহরের মরুভূমিতে ওয়েসিস খুঁজে যাবো। আর আমি সেটা পাবোও। একদিন আসবে তখন সেই ওয়েসিসের ধারে বসে আমি দু'দণ্ড ঠাণ্ডা জল খাবো। আপনি দেখবেন, সেইদিন আসবেই।" অলৌকিক পরিবেশ নির্মাণ করলেন লেখক।

ভাষার ব্যবহারে ব্রাত্য এই উপন্যাসে জাদুকর। ব্রাত্য যেন কথকঠাকুর। সহজ কথকতার ভঙ্গিতে, কখনও নিরুত্তাপ সংবাদভাষ্যে, কখনও হাল্কা রসিকতায় কাহিনিকে গতিময়তা দিয়েছেন। বিষয়ের গভীরতা এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয়নি তাতে। এই গঠন প্রক্রিয়ায় পাঠককে এতটুকুও অমনোযোগী হওয়ার সুযোগ দেননি ব্রাত্য। 'অদামৃতকথা'-য় পরিকল্পিত ভাবে ব্রাত্য পুরাতন বাংলা, তৎসম, অর্ধ তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই উপন্যাসের দাবি মেনে ব্রাত্য গদ্যের চলন দিলেন বদলে।

বৃহৎ উপন্যাস 'দ্যূতক্রীড়ক'। ব্রাত্যর বহুমুখী ব্যস্ততা আমাদের অজানা নয়। সেই ব্যস্ততা বজায় রেখে

এই বৃহৎ কাজটি যে সার্থকতায় সম্ভব করেছেন তার জন্য কী সাধুবাদ তাঁর প্রাপ্য, আমার শব্দভাণ্ডারে তা নেই। বঙ্গসাহিত্য যদি ধৈর্যশীল হয়, নিরপেক্ষ হয় — ব্রাত্যকে প্রাপ্য মর্যাদা দেবে আমার বিশ্বাস। পাঠক সাদরে গ্রহণ করবেন এই উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসের ইতিহাসে 'দ্যূতক্রীড়ক' আরেকটি মাইলস্টোন হিসেবে স্থায়ী আসন নেবে, আমার দৃঢ় প্রত্যয়।

এরকম ব্যাপ্ত উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে আর মাত্র কয়েকটি লেখা হয়েছে।

সমীর চট্টোপাধ্যায় : প্রাবন্ধিক ও নাট্য সমালোচক।